গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৩ মে - ৯ মে ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

বিলকিসের ঘটনা মোদির রক্তাক্ত গুজরাটের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল

বিলকিস বানোকে লাখো কুর্নিশ। কুর্নিশ তাঁর সাহসকে, তাঁর ১৭ বছরের কান্নাচাপা চোয়াল-শক্ত লড়াইকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গুজরাট সরকারের কাছ থেকে এতদিনে তিনি পেতে চলেছেন ৫০ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ, সরকারি চাকরি এবং বাসস্থান। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণে নিজের তিন বছরের মেয়ে সহ পরিবারের ১৪ জনকে চোখের সামনে খুন হয়ে যেতে দেখার কষ্ট, বার বার ধর্ষিত হওয়ার যন্ত্রণা এই রায় হয়ত মুছিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু বিলকিসের এই অসমসাহসী লড়াই একটি সাম্প্রদায়িক অসভ্য সরকারের গণহত্যাকে মদত দেওয়ার চরম অন্যায়কে অপরাধ বলে চিহ্নিত করে আবার তার আসল চেহারা দেশের মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিল, যার গুরুত্ব কম নয়। একবার ফিরে দেখা যাক সেই অন্ধকার দিনগুলোকে।

গুজরাট, ২০০২ সাল। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তখন নরেন্দ্র মোদি। ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে গোধরা স্টেশনের কাছে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগে। পুড়ে মারা যান ৫৯ জন, যাঁদের অনেকে ছিলেন অযোধ্যাফেরত করসেবক। এই ঘটনার পরদিন থেকে গুজরাট জুড়ে শুরু হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের উপর নৃশংস হামলা। গণহত্যা, ধর্ষণ, আগুন লাগানো, সম্পত্তি ধ্বংস চলতে থাকে নির্বিচারে। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা কারই রেহাই মেলেনি উগ্র হিন্দুত্ববাদী নরপশুদের হাত থেকে। নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বে গুজরাটের বিজেপি সরকার প্রত্যক্ষভাবে মদত দেয় এই পৈশাচিক তাণ্ডবে, যা বহু সাংবাদিকের রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছিল এবং গণদাবীতে সেইসময় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও যে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এই গণহত্যা বলে হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার করে, সেই গোধরা কাণ্ড কে বা কারা ঘটিয়েছিল, আদৌ তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কি না— সে সব প্রশ্নের উত্তর এখনও সঠিক ভাবে মেলেনি।

বিলকিস বানোর মর্মান্তিক কাহিনীর শুরুও ২০০২ সালে। ৩ বছরের কন্যাসন্তানের মা, পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এই গৃহবধূ সেই সময়ে ছিলেন গোধরার কাছেই রান্ধিকাপুর গ্রামে তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে। গোধরার

সাতের পাতায় দেখুন

বিচারপতিই বলছেন, টাকার থলি কবজা করছে আদালতকে

এমন একটা সময় ভারতের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল যাতে কিছু প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য। একদিকে নির্বাচনী প্রচার চলছে দেশ জুড়ে, অন্যদিকে রাফাল বিমান কেলেঙ্কারি নিয়ে মামলার নথিপত্র নতুন করে আদালত চেয়ে পাঠিয়েছে। তার সাথে আছে নরেন্দ্র মোদির বায়োপিক নিয়ে মামলা, অযোধ্যা জমি মামলা, আসামের এনআরসি মামলা ইত্যাদি। এর সাথে দাবি উঠছে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় সঠিক তদন্তের জন্য সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করুক। গুজরাট দাঙ্গার একটি মাত্র মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিলকিস বানো দৃষ্টান্তমূলক রায় পেয়েছেন, ফলে অন্য মামলাগুলিরও গতি পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ছে। গুজরাটে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার মামলাও (যাতে নাম জড়িয়ে আছে বিজেপি সভাপতির) নতুন করে উঠে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এইরকম এক সময়ে দাঁড়িয়ে দুটি অভিযোগ এ দেশের বিচারব্যবস্থাকে তোলপাড় করে দিল।

সুপ্রিম কোর্টের এক ছাঁটাই হওয়া মহিলা জুনিয়ার কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অভিযোগ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁকে যৌন হেনস্থা করেছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে ২০১৮ সালের অক্টোবরে বিচারপতি রঞ্জন গগৈ প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই। অভিযোগকারিনী ২২ জন বিচারপতিকে চিঠি দিয়ে এবং হলফনামার মাধ্যমে তাঁর অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঠিক একই সাথে আর একটি মারাত্মক অভিযোগ সামনে এসেছে। উৎসব সিং বাইনস নামে এক আইনজীবী হলফনামা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অভিযোগ করেছেন, গভীর ষড়যন্ত্র করে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সাজানো হয়েছে। বিশেষ একটি বৃহৎ ভারতীয় কর্পোরেট গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ঘা পড়ার আশঙ্কায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি বলেছেন, এই অভিযোগ সাজানোর জন্য তাঁকে দেড় কোটি টাকার টোপ দেওয়া হয়েছিল। তিনি অভিযোগ তুলেছেন, বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য ষড়যন্ত্রের

দুয়ের পাতায় দেখুন

জশিপুরে জনজোয়ার

ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনে জশিপুর কেন্দ্রে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী কমরেড শম্ভুধর নায়কের সমর্থনে ২৪ এপ্রিল বিশাল মিছিল

মোদি জমানায় বারাণসী
আলোর রোশনাইয়ের নিচে অন্ধকার

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে একটি ভিডিও— 'ভক্ত কা চশমা'। এই চশমা চোখে থাকলে দারিদ্র, বেকারি, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু কিছুই চোখে পড়ে না। সর্বত্র শুধু স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নয়নই চোখে পড়ে। ফসলের দাম না পাওয়া চাষির শুধু নুন আর লঙ্কা দিয়ে শুকনো ভাত খাওয়ার দৃশ্য এই চশমা দিয়ে দেখলেই রকমারি দামি দামি সুস্বাদু খাবারে ভরে ওঠে থালা। দারিদ্র জর্জরিত বস্তি মুহূর্তে ঝাঁ চকচকে বহুতলে পরিণত হয়। এমন চশমাই দেশের মানুষকে পরাতে চান ভোটবাজ দলগুলির নেতারা। দেখাতে চান নিজেদের রাজত্বে সর্বত্র কত উন্নয়ন তাঁরা করেছেন। চশমার আড়ালে ঢেকে রাখতে চান আসল ভারতকে— দারিদ্র, বেকারত্বে জর্জরিত বুভুক্ষু ভারতকে। এ ব্যাপারে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে শাসক বিজেপি। কারণ শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে প্রচারযন্ত্র তাদের কবজায়। তাই চশমার মালিকও তারাই।

ঠিক এ জিনিসই দেশের মানুষ দেখল বারাণসীতে। ক'দিন আগে সেখানে ছিল প্রধানমন্ত্রীর রোড শো। প্রধানমন্ত্রীর রোড শো বলে কথা। তা যদি ফ্লপ করে তবে তো দেশজুড়ে কর্মীদের নার্ভ ফেল করে যাবে। যত টাকা লাগে ঢালো। দেবে তো গৌরী সেনেরা। এল কোটি টাকা। ফলে লোকও হল দেদার। প্রধানমন্ত্রীর সভাগুলি সফল করতে সর্বত্রই কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তার জন্য বহু আগে থেকে ব্যাপক প্রচার, লোক জোটানোর খরচ, তাদের আনার জন্য গাড়ি, তাদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

'জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে' বইটি লক্ষ লক্ষ শোষিত নিপীড়িত মানুষকে সঠিক দিশা খুঁজে পেতে সাহায্য করছে

টাকার থলি কবজা করছে আদালতকে

একের পাতার পর

জাল বহু দূর বিস্তৃত। রাজনৈতিক নেতা, বৃহৎ পুঁজিপতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মাফিয়াদের নাম পর্যন্ত এই অভিযোগে উঠে এসেছে। অভিযোগ এসেছে, জায়গামতো টাকা ঢাললে যে কোনও রায় বদলে দেওয়া যায়।

মহিলা কর্মীর যৌন হেনস্থার অভিযোগের তদন্তের জন্য বিচারপতি বোবদের নেতৃত্বে তিন বিচারপতিকে নিয়ে অভ্যন্তরীণ কমিটি (ইন হাউস কমিটি) গড়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সাথে উৎসব সিংহের গভীর ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের জন্য প্রাক্তন বিচারপতি এ কে পট্টনায়েককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিবিআই, আইবি এবং দিল্লি পুলিশের প্রধানদের ডেকে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ তাঁদের নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি পট্টনায়েককে সাহায্য করতে। যদিও প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্থা মামলার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত বিচারপতি পট্টনায়েক তাঁর তদন্তের কাজ শুরু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যৌন হেনস্থা মামলার সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের কাজ তদন্ত কমিটির। কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে গভীর ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত অভিযোগটি।

বিচারপতি অরুণ মিশ্র আদালতে বসেই যে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন তা সারা দেশের পক্ষেই অত্যন্ত উদ্বেগের। তিনি বলেছেন, ধনী এবং ক্ষমতাশালীরা মনে করছে তারা সুপ্রিম কোর্টকে ইচ্ছামতো চালাতে পারে, ব্ল্যাকমেল করে নতজানু করতে পারে। প্রবল ক্ষোভের সাথে তিনি বলেছেন, টাকার থলি আর রাজনৈতিক শক্তির অঙ্গুলিহেলনে সুপ্রিম কোর্টকে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। যারাই বিচার ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করতে চাইছেন, তাঁদের অনেককে খুন করা হচ্ছে, না হলে তাঁদের চরিত্র হনন করা হচ্ছে। এসব চলতে দেওয়া যায় না। আরও বলেছেন, বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টায় দেশের ক্ষমতাশালীরা আগুন নিয়ে খেলছেন (দ্য হিন্দু ২৬.০৪.২০১৯)। সুপ্রিম কোর্টের একজন গুরুত্বপূর্ণ বিচারপতির এমন মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় যে, এ দেশের বিচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরে কী পরিস্থিতি চলছে। গত বছর জানুয়ারিতে বর্তমান প্রধান বিচারপতি সহ চারজন বিচারপতির নজিরবিহীন সাংবাদিক সম্মেলন বিষয়টিকে অনেকটাই জনসমক্ষে এনে দিয়েছিল।

সেদিনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি। নিজেদের পছন্দমতো লোক না পেলে বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়াকেই আটকে রাখা, বারবার সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের কাজে হস্তক্ষেপ, এসব তো তারা করছেই, এমনকী বিচার বিভাগের অভ্যন্তরে কোন বিচারক কোন মামলা শুনবেন তাতেও সরকারি হস্তক্ষেপের চেষ্টার ইঙ্গিত প্রবীণ চার বিচারপতির সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যেই ছিল। কিন্তু তারপরেও সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশের ফাইলটির উপর সরকার চেপে বসেই থেকেছে। এর বেশিরভাগই কার্যকরি করতে তারা বাধা দিয়ে চলেছে। গুজরাট দাঙ্গা, গুজরাটের ভুয়ো সংঘর্ষ মামলাগুলিকে অকার্যকরী করে দিতে বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করা হয়েছে। বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া বিচারকের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। সিবিআই, এনআইএ-র মতো তদন্ত সংস্থাগুলির এখন একমাত্র কাজ হয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের মতো বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্তগুলিকে বিপথগামী করে দিয়ে তাঁদের যাবতীয় অপরাধ থেকে ছাড় পাইয়ে দেওয়া। মালেগাঁও, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ, সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ মামলাগুলির বিচারকে পুরোপুরি প্রহসনে পরিণত করতে সরকার সরাসরি আসরে নেমেছে। স্বামী অসীমানন্দকে ছেড়ে দিতে হওয়ায় বিচারক হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, সব বুঝতে পারলেও তদন্তকারীদের অসহযোগিতায় কিছুই করা গেল না। বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে বিস্ফোরণ মামলায় এনআইএ ক্লিনচিট দিয়েছে শুনে খোদ বিশেষ আদালতের বিচারক বলেছেন, এমন কোনও এক্তিয়ারই তাদের নেই। অথচ তারপরেও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞার প্রার্থীপদ খারিজ হয়নি।

আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষক রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে ধনকুবেরদের টাকার থলির কাছে সমস্ত নীতি-নৈতিকতাকে বিকিয়ে দিয়েছে, ... নির্লজ্জ গণতন্ত্রহরণ আর লুঠপাট-দুর্নীতিই আজ শাসকদের ভরসা। বিচারালয়েও এর লক্ষণ প্রকট হয়ে ফুটে বেরিয়েছে।

সরকারি সংস্থা ওএনজিসির তেল-গ্যাসের খনিতে রিলায়েন্স ডাকাতি চালালেও আম্বানিদের বাঁচাতে বিচার বিভাগের গলা টিপে ধরেছে বিজেপি সরকার।

রাফাল বিমান কেনায় দুর্নীতি সহ গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি শোনার ঠিক আগেই প্রধান বিচারপতি সহ গোটা সুপ্রিম কোর্টকে এমন একটি বিতর্কের আবর্তে ফেলে দিয়ে সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি না সে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। বিচারপতি অরুণ মিশ্র যে গুরুতর অভিযোগগুলি তুলেছেন, সেগুলির গভীরে অবশ্যই যাওয়া দরকার। কারণ এ দেশে গণতন্ত্রের যে ঠাটবাটটুকু অন্তত টিকে আছে তাকে রক্ষা করাটা দেশের মানুষের জন্যই দরকার। এর আগেও ২০১৭ সালে ভুয়ো মেডিকেল কলেজের অনুমোদন সংক্রান্ত মামলায় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে পর্যন্ত দুর্নীতিতে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এক হাইকোর্ট বিচারপতি এই মামলায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তারও হয়েছেন। বিচারপতি মিশ্র নিজে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বিচারকের দেওয়া রায়টিকেই বদলে লেখা হয়েছে। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে একেবারে সর্বোচ্চ আদালতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কান পাতলেই এমন অসংখ্য ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুর্নীতি বন্ধ করবে কে? প্রশাসনের কর্তা, পুলিশ থেকে শুরু করে বহু ক্ষেত্রে বিচারকের চেম্বার পর্যন্ত যে এই দুর্নীতিবাজদের হাত বিস্তৃত তা কি অস্বীকার করা যাবে? রাজ্যে রাজ্যে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিংবা নিম্ন আদালত কোনও অভিযোগই নেয় না। ক'টা মানুষের সাধ্য থাকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত গিয়ে বিচার চাওয়ার? একেবারে অতি সাধারণ মানুষের বিচার পাওয়ার এই অধিকার রক্ষার জন্য কি সর্বোচ্চ বিচারালয়ের দায় থাকবে না?

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে বসেই সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি দলের কবজায় আনার কাজ শুরু করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বশাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বিজেপি। বিজেপির শীর্ষ নেতাদের মনমতো না চলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরপর দুজন গভর্নরকে অকালে সরতে বাধ্য করা হয়েছে। সিবিআইয়ের ডিরেক্টর রাফাল বিমান কেনার কেলেঙ্কারির তদন্ত নিয়ে এগোতে চাওয়া মাত্রই তাঁকে মাঝরাতে বরখাস্ত করে নিজের লোক বসিয়েছে বিজেপি সরকার। ইডি, এনআইএ ইত্যাদি তদন্ত সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। ভোটে বিজেপির বিরোধী প্রার্থীদের হয়রান করার কাজে আয়কর দপ্তরকে ব্যবহার করা হচ্ছে এই অভিযোগকে কিছুটা মান্যতা দিতে নির্বাচন কমিশনও বাধ্য হয়েছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগের তদন্ত করার মতো মেরুদণ্ডটাও কমিশন কর্তারা খুঁজে পাচ্ছেন না।

যে সংসদকে প্রণাম করে নরেন্দ্র মোদি ২০১৪তে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হওয়ার ঢং করেছিলেন, সেই সংসদকে বিজেপি প্রায় অকেজোই করে দিয়েছে। লোকসভায় নিজেদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকলেও রাজ্যসভায় যেহেতু তারা দুর্বল তাই জমি অধিগ্রহণ বিল সহ বেশিরভাগ বিল নিয়ে আলোচনাই হতে দেয়নি বিজেপি। এই সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করায় রেকর্ড করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পর্যন্ত তার সমস্ত গুরুত্ব হারিয়েছে। রাফাল চুক্তি পরিবর্তন থেকে শুরু করে নোট বাতিল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা জানতেই পারেননি। পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি সভাপতি, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা আর এক-দু'জন আমলার দ্বারা। সরকার পরিচালনার গণতান্ত্রিক সমস্ত রীতি-নীতিকেই কবরে পাঠিয়েছে বিজেপি সরকার। এরপর সুপ্রিম কোর্টে এই সংকট সরকারকে আরও সুবিধা করে দিচ্ছে বিচারব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিজেদের পকেটে পোরার। যদিও কংগ্রেস আমলেই বিচারব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টার শুরু। ইন্দিরা গান্ধী স্লোগানই তুলেছিলেন, 'কমিটেড জুডিশিয়ারি'। অর্থাৎ বিচারব্যবস্থাকে সরকারের তালে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বিচারপতিদের মধ্যে একমাত্র আর পি খান্না মুখ খুলেছিলেন। সেই অপরাধে সিনিয়রিটি এবং সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার তাঁকে প্রধান বিচারপতি হতে দেয়নি। এরকম উদাহরণ অজস্র আছে। বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ, প্রমোশন, অবসরের পর নানা সরকারি কমিটিতে বিচারপতিদের রাখা ইত্যাদি কাজে নিরপেক্ষতার বালাই রাখেনি কংগ্রেসও। এই দিয়েই তারা বিচারপতিদের নিজেদের কবজায় রাখার চেষ্টা করে গেছে। বিজেপি এসে সেই চেষ্টাকে একেবারে সীমাহীন নগ্নতায় নিয়ে গেছে।

বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটা মহান গরিমার ছবি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্ণধাররা প্রচার করতেন কিছুদিন আগেও। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লাগামহীন শোষণ-শাসনে সৃষ্ট জনমানসের ক্ষতে প্রলেপ দিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই একটা বিশেষ অঙ্গ হিসাবে আদালতকে রাষ্ট্র-কর্তারা এভাবেই ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। দিন যত গড়িয়েছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্র ক্রমাগত অন্তর্ধান করেছে। আমলাতন্ত্র আর পুলিশ-মিলিটারির পেশির জোরেই মূলত বুর্জোয়া গণতন্ত্র টিকে আছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের খোলসটুকুকে এই ব্যবস্থা ধরে রেখেছে শুধুমাত্র জনগণের চোখে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। একদিন যে গণতন্ত্রের ঝান্ডা তুলে আব্রাহাম লিঙ্কন ঘোষণা করেছিলেন, 'গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' (জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা এবং জনগণে জন্য) বুর্জোয়া গণতন্ত্র আজ তার থেকে বহু দূরে। জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-অধিকারকে দুপায়ে দলে পিষে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের মুনাফা অর্জনকে নিশ্চিত করাই আজ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই অঙ্গ বিচারব্যস্থার আপাত স্বাধীনতা, তার নিরপেক্ষতা এগুলি দিনে দিনে অন্তর্ধানের পথেই গেছে। ভারতও এর বাইরে নয়। কোন দল ভোটে জিতবে থেকে শুরু করে, কোন মন্ত্রকে কোন মন্ত্রী-আমলা বসবে, সামরিক বাহিনী কোন বিমান বা অস্ত্র কিনবে ইত্যাদি, এমনকী বিচারব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টাকার থলির মালিকদের নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত হয়। যে দল যখন শাসন ক্ষমতায় থাকে তারা এই বিষয়গুলিকে তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগায়। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষক রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে ধনকুবেরদের টাকার থলির কাছে সমস্ত নীতি-নৈতিকতাকে বিকিয়ে দিয়েছে, এ ব্যবস্থার সর্বত্রই তার ছাপ পড়েছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোনও প্রতিষ্ঠানেই আজ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই ব্যবস্থার রক্ষকরা একটা সংকট সামাল দিতে না দিতেই আবার এমন গভীর সংকটে পড়েছে যে, গণতন্ত্রের আব্রুটুকু বাঁচিয়ে চলাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নির্লজ্জ গণতন্ত্রহরণ আর লুঠপাট-দুর্নীতিই আজ শাসকদের ভরসা। বিচারালয়েও এর লক্ষণ প্রকট হয়ে ফুটে বেরিয়েছে।

কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখ না করলে চলে না, বিচারপতি মিশ্র নিজেই বলেছেন, বিচারালয় বিচারপতিদের নয়, দেশের সাধারণ মানুষের সম্পত্তি। বিচারপতিরা আসেন-যান, দেশের মানুষ কিন্তু টিকে থাকে। এই আদালতকে সত্যিই কি দেশের অগণিত খেটেখাওয়া নিপীড়িত মানুষ নিজেদের বিচারালয় মনে করতে পারে! সেখানে টাকার থলির দাপট কি শুধু দুর্নীতির হাত ধরে খিড়কির দরজাতেই কাজ করছে? আদালতের সদর দরজাতেও কি অর্থবান-ধনবানদের জয়জয়কারই চলছে না! অতীতে এ দেশ পেয়েছে বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ারের মতো বিচারপতিদের। যাঁরা ছিলেন দেশের খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি যথার্থ দরদি। তাঁদের চেষ্টা ছিল যতদূর সম্ভব শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারকে আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া। ধীরে ধীরে দরিদ্র-খেটেখাওয়া মানুষের প্রতি সেটুকু সমবেদনার বাষ্পও বিচারালয় থেকে কবেই উবে গেছে। বিশ্বায়ন-উদারিকরণের যুগে বিচার বিভাগও বেসরকারিকরণ, শিক্ষায় ম্যানেজমেন্ট কোটা, ক্যাপিটেশন ফি ইত্যাদির পক্ষেই অবস্থান নিয়ে চলছে। এখন প্রতিবাদ, ধর্মঘট সহ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের যে কোনও রকম রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টার উপরই আদালত খড়গহস্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট মোচনের স্বার্থে বিচারালয় যত বেশি করে জনস্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধনকুবেরদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত হচ্ছে, ততই তার নিজের আপাত স্বাধীনতাও ক্রমাগত খর্ব হচ্ছে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দাপটের সামনে।

আদালতকে টাকার থলি আর রাজনৈতিক দাপট থেকে রক্ষা করার আর্জি আজ উঠে আসছে দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতির মুখে। এই পরিস্থিতিই দেখিয়ে দেয়, গণতান্ত্রিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে কী মারাত্মক খেলায় নেমেছে বিজেপি সরকার। একে রুখতে হলে ভোটের বাক্সের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না, দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষায় শক্তিশালী গণআন্দোলনের শক্তিতেই কেবল এই অপচেষ্টাকে রোখা সম্ভব।

মহান স্ট্যালিন রাশিয়ার মানুষের কাছে ন্যায়ের প্রতীক ঃ বলছে সমীক্ষা

আজও মহান নেতা স্ট্যালিনের ঐতিহাসিক অবদানকে শ্রদ্ধা করেন ৭০ শতাংশ রুশ নাগরিক। সম্প্রতি স্বাধীন সংস্থা লেভাদা সেন্টার পরিচালিত এক সমীক্ষায় উঠে এল এই তথ্য।

আরও একটি কথা বারবার উঠে আসছে একাধিক সমীক্ষায়— সমাজতন্ত্রের সেই সুখময় দিনগুলি ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেন রাশিয়া এবং পূর্বতন সোভিয়েতের সবকটি অঙ্গরাষ্ট্রের কোটি কোটি মানুষ। তাঁদের রাশিয়া এখন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্যতম সদস্য। মারণাস্ত্রের ঝঙ্কারে সে দেশ পাল্লা দিচ্ছে মার্কিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে প্রায় সমানে সমানেই। অথচ একদিন যে শ্রদ্ধা জাতি হিসাবে তাঁরা বিশ্বের মানুষের কাছে পেয়েছেন, আজ তা কোথায় অন্তর্হিত! এ কথা তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। তাঁরা দেখেছেন, ফুটবল বিশ্বকাপের কী বিশাল আয়োজন করেছিল তাঁদের দেশ। সেখানে জৌলুস-বৈভবের প্রদর্শনী ফেলে সারা বিশ্বের থেকে আগত অতিথিরা দেখতে চেয়েছেন, সেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের স্মৃতিচিহ্নগুলি। এই শ্রদ্ধার আসন পাতা হয়েছিল কোন ভিত্তির উপর? জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সিনেমা থেকে শুরু করে খেলাধূলা তো বটেই, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন অবদান রাখছে সমজাতান্ত্রিক সমাজ— এই ছিল সেই শ্রদ্ধার ভিত্তি। তাই আজ কাজাখস্তানের আধুনিক তরুণী সাংবাদিকদের বলেন, সোভিয়েত আমলে ছিল নারীর যথার্থ স্বাধীনতা। ভোগবাদী দুনিয়ার সাথে মৌলবাদের অদ্ভুত মিশেলে গড়ে ওঠা এক নতুন ক্ষমতার থাবার কাছে আজ আমরা তা হারাচ্ছি।

এই কলকাতার বাসিন্দা নবতিপর এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর মুখে শোনা এক স্মৃতিচারণ মনে পড়ে। তিনি তখন সদ্য যুবক, চিনির ব্যবসার সূত্রে গিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে। সালটা বোধহয় ১৯৫১-৫২ হবে। যে মহল্লায় তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, একদিন দেখেন সেটি আলোর মালায় সাজানো হয়েছে। কারণ জানতে পেরে অবাক তিনি। এক শিশুর জন্ম হয়েছে, তাকে নিয়ে মা ফিরবেন হাসপাতাল থেকে। গোটা সোভিয়েত সমাজের পক্ষ থেকে ওই মহল্লার মানুষ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক শিশুটিকে স্বাগত জানাচ্ছে, আর সংবর্ধনা দিচ্ছে মা-কে। এই ছিল মানুষ সম্বন্ধে সে দেশের দরদি দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেই মানুষটিই ১৯৯০-এর দশকে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর দেখেছিলেন বেওয়ারিশ অনাথ শিশুর দল রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে, মস্কোর রাস্তায় বরফের মধ্যে বসে জুতো পালিশ করে নিজের পেট চালায় ১২-১৩ বছরের কিশোর। আজ রাশিয়ার মানুষ দেখে, যে গণিকাবৃত্তিকে নির্মূল করে দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ, আবার তা ফিরে এসেছে। যে দেশে সমাজতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষের পারিবারিক বন্ধন, মানুষে মানুষে বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল, আজ সে দেশে বাড়ছে পরিবারের ভাঙন, অশান্তি। ফিরে এসেছে বেকারি, ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্য। ফিরে আসছে ধর্মীয় গোঁড়ামি, মৌলবাদ, জাতি-সম্প্রদায়গত বৈরিতা— যে দুঃস্বপ্নগুলিকে বিদায় করে দিয়েছিল সমাজতন্ত্র।

লেভাদা সেন্টারের জনমত সমীক্ষা দেখিয়েছে, রাশিয়ার অর্ধেকের বেশি মানুষের কাছে আজও স্ট্যালিন মানে 'ন্যায়ের প্রতীক'। ব্যক্তিস্বাধীনতা-গণতন্ত্র ইত্যাদি ধারণাগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের যে ভোলানো হয়েছে, তা তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কী হারিয়েছেন তা ভেবে আফশোস করেন বহু মানুষ। অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সমাজবিজ্ঞানী বাইজভের কথায়, বর্তমান রাষ্ট্রপতি পুতিনের সরকারকে দেশের বেশিরভাগ মানুষ দেখেন নিষ্ঠুর এবং অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শক্তি হিসাবে। মনে করেন, মানুষের প্রতি কোনও দরদ নেই সরকারের। অন্যদিকে তাঁরা চান স্ট্যালিনের আমলের দরদি শাসনব্যবস্থা আবার ফিরুক। লেভাদা সেন্টারের সমীক্ষকরা বলেছেন, স্ট্যালিনকে স্বৈরাচারী হিসাবে তুলে ধরে সরকারি সংবাদমাধ্যম যতই প্রচার করুক, ২০০০ সালেও যত মানুষ তাতে বিশ্বাস করতেন ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা কমছে। মানুষ বলতে শুরু করেছে, স্ট্যালিন একজন 'অনন্যসাধারণ নেতা'। যত বছর যাচ্ছে, তত বাড়ছে স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধাবান মানুষের সংখ্যা।

লেভাদা সেন্টারের সমীক্ষকরা দেখেছেন, সোভিয়েত আমলের সামরিক কুচকাওয়াজ থেকে সঙ্গীত, এমনকী শ্রেষ্ঠ শ্রমিকের পুরস্কারের মতো আদ্যন্ত সমাজতান্ত্রিক একটি কর্মসূচিকে পুরোপুরি নকল করছে বর্তমান পুঁজিবাদী শাসকরা। কারণ সমাজতন্ত্রের গৌরব আজও যে উচ্চতা নিয়ে মানুষের মনে স্থান করে আছে, তাকে ব্যবহার করে পুতিন সেই জাতীয়তাবোধের উত্তরাধিকারী বলে নিজেকে সাজাতে চান।

সমস্ত বয়সের মানুষের মতামত সংগ্রহ করে সমীক্ষকরা দেখেছেন, সমাজতন্ত্রে যুবকরা ছিল জীবনের প্রতীক। তারা ছিল সবচেয়ে উদ্যোগী এবং প্রাণবন্ত। ছিল রাজনীতি সচেতন, দেশের সমস্ত কাজে, উৎপাদনে তাদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। অথচ আজকের যুবকরা বেশিরভাগই বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত ও উন্নাসিক হয়ে পড়ছেন। দেশের ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবার তাগিদটাই যেন তাদের চলে গেছে। কিন্তু এঁরাও এখন বলতে শুরু করেছেন সমাজতন্ত্রের কথা। বহু যুবক স্ট্যালিনকে দেশের গৌরবের প্রতীক হিসাবেই দেখেন। এতদিন বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম প্রচার করত, কেবলমাত্র বৃদ্ধেরাই সমাজতন্ত্র তথা স্ট্যালিনের স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকে। এই সমীক্ষা উল্টে দিয়েছে সেই কথাকে। সমীক্ষকদের হিসাবে দেশের অর্ধেকের বেশি নাগরিক স্ট্যালিনকে বড় মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। ৪১ শতাংশ মানুষ তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।

অথচ সেই ১৯৫৬ সাল থেকে সারা দুনিয়া জুড়ে কত কী-ই না প্রচার করা হয়েছে এই মহান নেতার বিরুদ্ধে। সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের নেতা ক্রুশ্চেভের হাত ধরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস থেকে শুরু হয়েছিল স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসার ঝড়। সাম্যবাদী আন্দোলনের আলখাল্লা গায়ে চাপিয়েই সংশোধনবাদী নেতৃত্বের এই অপপ্রচারকে স্বাভাবিকভাবেই লুফে নিয়েছিল মার্কিন-ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণ শানাতে স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। দেশে দেশে বই মুখস্থ করে সমাজতন্ত্র বোঝা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও সেই কথাই আউড়েছে। বহু কমিউনিস্ট, বামপন্থী সৎ মানুষও এতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। যেহেতু খোদ রাশিয়ার লেনিন-স্ট্যালিনের হাতে গড়া পার্টির নেতার মুখ থেকেই এই প্রচারের শুরু, ফলে অনেকের পক্ষেই সত্যটা ধরতে অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান প্রয়োগ করে সেদিনই এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চোখে সংশোধনবাদী নেতৃত্বের আসল রূপ এবং এই কুৎসার কারণ ধরা পড়ে যায়। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে দুনিয়া জুড়ে অবাধ দস্যুবৃত্তি চালাচ্ছে, সাধারণ মানুষের জীবনের সবকিছু ছারখার হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় শোষিত-নিপীড়িত মানুষের বিবেকের কাছে সমাজতন্ত্রের আহ্বান নতুন করে ধাক্কা দিচ্ছে। তার সাথেই অবধারিত ভাবে উঠে আসছে মহান স্ট্যালিনের নাম। কারণ সমাজতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজ আর স্ট্যালিন এক এবং অবিচ্ছেদ্য। এগুলিকে কেউ আলাদা করতে পারে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, স্ট্যালিনকে আক্রমণের কারণ একটাই, তাঁকে না সরালে সমাজতন্ত্রকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আঘাত করার সাধ্য নেই কারও।

এই মহান মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর সমসাময়িক সারা বিশ্বের সকল মনীষী এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের দিকপাল ব্যক্তিত্বরা। রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, 'রাশিয়া ও বিশ্বের জনগণের ইতিহাসে যেন তিনি খুলে দিয়েছেন এক ধ্রুপদী যুগ।' বস্তুত মার্কিন সাংবাদিক থেকে শুরু করে দুনিয়ার বহু মানুষই সেই যুগটাকে স্ট্যালিন যুগ বলেই অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী ও নাট্যকার বার্নার্ড শ বলতেন, 'পৃথিবীতে একটিমাত্র দেশ আছে যেখানে তুমি সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে পার— তার নাম রাশিয়া, সেখানে মহান স্ট্যালিন বেঁচে আছেন।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ট্যালিনের আমলেই রাশিয়া গিয়ে বলেছিলেন, 'না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।' আইনস্টাইন, জেবিএস হ্যালডেন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বিজ্ঞানীরা, চার্লি চ্যাপলিনের মতো মানবদরদি শিল্পী, আরও অগণিত বিশিষ্ট মানুষ সেদিন স্ট্যালিনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আর গভীর শ্রদ্ধায় স্ট্যালিনের নাম বুকে বহন করে লড়েছেন সারা দুনিয়ার গণতন্ত্রপ্রিয় কোটি কোটি জনগণ। ভারত সহ নানা দেশের স্বাধীনতা যোদ্ধারা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন তাঁদের মনে স্থান করে নিয়েছে একটাই ভরসা — স্ট্যালিন আছেন, তাই সাম্রাজ্যবাদ জিততে পারে না, শেষ কথা বলবে শোষিত জনগণই। যে কথা ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার আপসহীন যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে রাশিয়ার অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা মারাত্মক চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ে দেশকে এবং সমাজতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্য স্ট্যালিন যখন চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাদের প্রকাশ্যে বিচারের ব্যবস্থা করেছেন, সেই বিচারের স্থলে উপস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশি কূটনীতিক, দেশি-বিদেশি অসংখ্য সাংবাদিকদের সামনে এমন প্রকাশ্য বিচারের কথা কোনও তথাকথিত গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সরকার কোনওদিন কল্পনাও করতে পারবে না। তাই দেখা গেছে, যে সময়টাকে দেখিয়ে পরবর্তীকালে স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসাকে চরমে তোলা হয়েছে, ঠিক সেই সময়টার প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা মনীষী।

কিন্তু ক্রুশ্চেভের হাত ধরে সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব সংশোধনবাদীদের কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী-বৃহৎ পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম স্ট্যালিনকে নিয়ে অপপ্রচারের সুযোগ পেয়ে যায়। কুৎসা চলতে থাকে— তিনি রক্তপিপাসু, ডিক্টেটর, খুনি ইত্যাদি কোনও কথাই তারা বাদ দেয়নি। শুধু স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে লেখার কারণেই কিছু লেখককে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সংশোধনবাদীদের প্রভাব থাকায় সঠিক বামপন্থা, কমিউনিস্ট আদর্শ মাথা তুলতে বাধা পেয়েছে সাম্যবাদী আন্দোলনের ভিতর থেকেই। ফলে স্ট্যালিন সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নের কণ্ঠ চাপা পড়ে গেছে। সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করে গেছে কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এসইউ সিআই (সি)। কিন্তু সেদিন প্রতিবাদের শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের, সংশোধনবাদীদের বিপুল প্রচারশক্তির তুলনায় কিছুই ছিল না। যদিও সত্যকে যে গলা টিপে হত্যা করা যায় না, আজকের রাশিয়ার মানুষের উপলব্ধি সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নেতারা স্ট্যালিনকে ঠিকমতো না বোঝার ফলে সংশোধনবাদের খপ্পরে পড়েছেন। সমাজতন্ত্র যে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল নয়— হাজার হাজার বছরের শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে বদলে একটা নতুন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াই— মার্কসবাদের এই বুনিয়াদি শিক্ষাটাকেই তাঁরা ভুলে গেলেন। এই পথে চলতে চলতে অবশেষে তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই ত্যাগ করেছেন। স্ট্যালিনের সঠিক গাইডলাইন না মানায় সমাজতান্ত্রিক শিবির দুর্বল হয়েছে। রাশিয়া, চীন সহ প্রায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছে পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন। দিন যত গড়িয়েছে রাশিয়া সহ একদা সমাজতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া দেশগুলির জনগণ বুঝতে শুরু করেছেন কী হারিয়েছেন তাঁরা। নতুন করে লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে রাশিয়া, সোভিয়েতের পুরনো অঙ্গরাষ্ট্রগুলিতে রাস্তায় নামছে মানুষ। পথের অনুসন্ধান করছেন তাঁরা। যে অনুসন্ধানে অবধারিতভাবে উঠে আসছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই এই মহান বৈজ্ঞানিক দর্শনকে একটা বিরাট যুগ ধরে যিনি বিশেষীকৃত করেছেন, সেই স্ট্যালিনের নামকে সত্যানুসন্ধানী মানুষ খুঁজে পাবেই। যে কারণে এত অপপ্রচারেও তাঁকে মুছে দেওয়া যাচ্ছে না।

আসলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণে জর্জরিত মানুষ যত মুক্তির পথ খুঁজবে— ততই পাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, পাবে স্ট্যালিন, মাও সে-তুং-কে, পাবে তাঁদের উত্তরসূরি শিবদাস ঘোষকে। এই সত্যকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন— "তত্ত্বগত ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে শুধু নয়, সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন অসামান্য সংগঠক হিসাবেও মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সঙ্গে স্ট্যালিনও আমাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন লেনিন, আর স্ট্যালিন তাকে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছেন" (সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে)। প্রমাণ হচ্ছে, মানুষের স্মৃতিপটে স্ট্যালিন উজ্জ্বল হয়েই আছেন। মহান স্ট্যালিনকে মুছে দেওয়া যায় না। (তথ্যসূত্র ঃ মস্কো টাইমস ১৬.০৪.২০১৯)

নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেও দেশজুড়ে পালিত হল

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর ৭১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বক্তব্য রাখছেন কমরেড সৌমেন বসু

বিশাল জমায়েতের একাংশ

২৪ এপ্রিল কলকাতায় মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মৃতি বিজড়িত দলের কেন্দ্রীয় অফিস ৪৮ লেনিন সরণিতে রক্তপতাকা উত্তোলন ও কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

২৪ এপ্রিল দলের ৭১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গ্রাউন্ডে জেলার কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক দরদির উপস্থিতিতে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগণার চারটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি শহরে সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

তিরুপতির জমায়েতের একাংশ

কর্ণাটক ঃ ৭১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২৬ এপ্রিল বাঙ্গালোরের ইউভিসিই অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক শত ছাত্র-যুবক সাধারণ মানুষ যোগ দেন। প্রধান বক্তা পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, বিজেপিকে রোখার নামে কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করার যে নীতি সিপিআই-সিপিএম নিয়েছে তাতে বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করার জন্য কর্মী সমর্থকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ভারতবর্ষের বুকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করার পথে সঠিক বিপ্লবী দল এসইউসিআই(সি)-কে গড়ে তুলেছিলেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। এই দলকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে উমা। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এমএন শ্রীরাম।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ ৭১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২৭ এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড জি ললিতা। কমরেড গোবিন্দরাজালু কমরেড রাধাকৃষ্ণের ভাষণ অনুবাদ করে শোনান।

গুজরাট ঃ ২৮ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভা অনুষ্ঠিত হয় বদোদরায়। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকা রথ দলের কর্মী সমর্থকদের আদর্শগত-সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে জোর দেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী। সভাপতিত্ব করেন, রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড তপন দাশগুপ্ত।

আগরতলায় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকির সভা

হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর। (ডানদিকে) জমায়েতের একাংশ

ত্রিপুরা ঃ ২৬ এপ্রিল আগরতলার শকুন্তলা রোডে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা কমরেড অরুণ ভৌমিক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। তিনি নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে বিপ্লবী আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান।

হায়দরাবাদে রেজাল্ট কেলেঙ্কারিতে ২০ জন ছাত্র আত্মঘাতী

ডিএসও-র আন্দোলনে পুলিশের লাঠি

তেলেঙ্গানা রাজ্যের ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন বোর্ড কর্তৃপক্ষের মর্মান্তিক গাফিলতিতে প্রাণ গেল ২০ জনেরও বেশি ছাত্রের। ২৫ এপ্রিল প্রকাশিত রেজাল্টে ব্যাপক ভুলভ্রান্তির কারণে ছাত্ররা হতবাক হয়ে যায়। তালিকায় শত শত ছাত্রকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে। অথচ তারা প্রত্যেকেই পরীক্ষায় বসেছিল। প্রথম বর্ষের এক ছাত্র যে গতবার সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল তাকে তেলেগু বিষয়ে শূন্য দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩.২৮ লক্ষ ছাত্র ফেল করেছে। এহেন রেজাল্ট বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকেরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। প্রায় ৯.৭৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর খাতা দেখার জন্য সরকার এমন একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল যাদের এত খাতা সময় মতো দেখার ব্যবস্থাই নেই।

ফলে লক্ষ লক্ষ ছাত্র বিপাকে পড়েছে এবং ২০ জনেরও বেশি ছাত্র আত্মঘাতী হয়েছে। এই ক্ষমাহীন অবহেলাকে ধিক্কার জানাচ্ছে সকলে। সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য ২৯ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ-আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ এই বিক্ষোভে লাঠি চালায় এবং ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে সারাদিন জেলে আটকে রাখে। ছাত্ররা দাবি করেছে, আত্মঘাতী প্রত্যেক ছাত্রের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ভাড়াটে সংস্থাকে দিয়ে খাতা দেখানো বন্ধ করতে হবে এবং রেজাল্ট বিপর্যয়ে দোষীদের যথপোযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

মিছিল ও দেওয়াল লিখনে ভোটের প্রচার

জামশেদপুর কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড পানমনি সিং-এর প্রচারে মিছিল

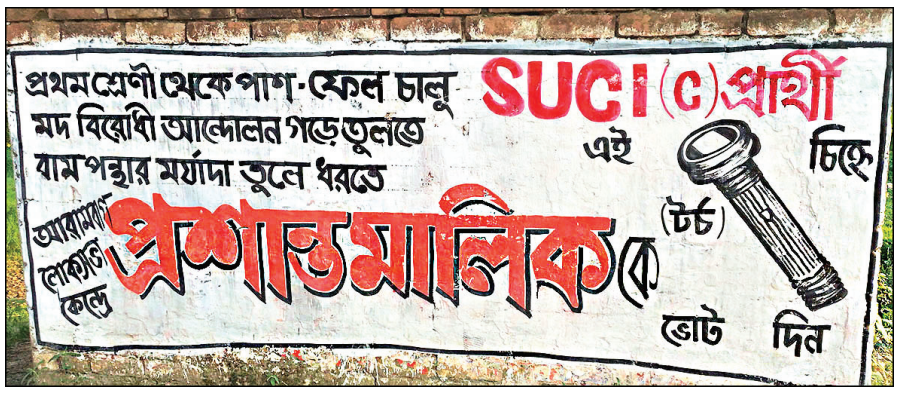

শ্রদ্ধায় স্মরণ বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তকে

স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের ১১০তম জন্মদিন ২৯ এপ্রিল। ‘লবণ আইন অমান্য’ আন্দোলনের সময় ১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল অত্যাচারী জেলাশাসক পেডিকে কলেজিয়েট স্কুলের একটি কক্ষে তিনি এবং জ্যোতিজীবন ঘোষ চরম শাস্তি দেন। পরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে শাস্তি দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। নিশ্চিত ফাঁসি থেকে রক্ষা পেলেও প্রবল অত্যাচার করে তাকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

স্বাধীন ভারতবর্ষে সরকারি কোনও সাহায্য না নিয়ে মাথা উঁচু করে কলেজিয়েট স্কুলে টিফিন বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করেছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পরিবর্তে দেশ আপসমুখী নেতৃত্বের হাত ধরে পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হওয়ায় শোষণমুক্তির লক্ষ্যে আমৃত্যু বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত ভারতবর্ষের।

বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এই বিপ্লবীর জন্মদিনটি যথাযথ মর্যাদায় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের সামনে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পঙ্কজ পাত্র, দীপক বসু, অমল মাইতি সহ স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। পঞ্চানন বাবু বিমল দাশগুপ্তদের মতো বিপ্লবীদের অপূরিত স্বপ্ন পুরণে এগিয়ে আসার জন্য ছাত্রযুবদের আহ্বান জানান।

প্রতিশ্রুতি ফাঁকা আওয়াজ

দেশে মহিলা ভোটার কমবেশি ৫০ শতাংশ। এদের ভোট পাওয়ার জন্য সংসদীয় দলগুলি মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলছে। বিজেপি, কংগ্রেস উভয় দলই পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। যদিও এই দুই দলের কেউই নিজেদের প্রার্থী তালিকায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন বরাদ্দ করেনি। বহু ক্ষেত্রেই দলীয় নেতাদের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রার্থী হিসাবে মহিলারা বিবেচিত হন না। আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে আজও মহিলাদের দুর্বল হিসাবে ভাবার, দেখার মানসিকতা রয়েছে। যে কারণে নারীর ক্ষমতায়নের দাবিও উঠেছে। প্রশ্ন হল, ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করে দিলেই কি নারীর ক্ষমতায়ন হবে?

ক্ষমতায়নের আক্ষরিক অর্থ হল নারীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করা। তাঁদের মর্যাদাসম্পন্ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য কী? গত নির্বাচনে বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর এমন ল্যাজে- গোবরে অবস্থা যে, এবার চাকরির কথা বলতেই তিনি সাহস পাচ্ছেন না। নরেন্দ্র মোদি সরকার কর্ম ও কর্মী-সংকোচনের যে নীতি নিয়ে চলছে তাতে শুধু পুরুষরাই নয়, কাজ হারাচ্ছেন মহিলারাও। অথবা চাকরির সম্ভাবনা শুধু পুরুষদেরই সঙ্কুচিত হচ্ছে তা নয়, সঙ্কুচিত হচ্ছে মহিলাদেরও। দেশে লক্ষ লক্ষ মহিলা পরিচারিকার কাজ করেন। আজও কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই এঁদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। এরা যখন বলে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, তখন তা মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্রুপ ছাড়া আর কী!

নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি চাই নারীর নিরাপত্তা— সরকার কি তা নিশ্চিত করতে পেরেছে? দেশের সর্বত্র নারী-আন্দোলনের অন্যতম দাবি মদ নিষিদ্ধ করা। কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকার কি এই দাবির প্রতি মর্যাদা দিয়েছে? সরকার মদের ব্যাপক লাইসেন্স দিয়ে রাজস্ব বাড়াচ্ছে। হাজার হাজার নারী-শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। অর্থলোভী একদল মানুষ অভাবগ্রস্ত পরিবারের মেয়েদের কাজ দেওয়ার নাম করে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। এঁদের কি নিরাপত্তা দিতে পেরেছে সরকার? কতটুকু ভূমিকা নিয়েছে পাচার হওয়া নারীদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে? আবার যাঁরা উদ্ধার হয়েছেন, তাঁদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা নিয়েছে? প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তার।

এছাড়া মাদকাসক্ত সমাজবিরোধী চক্র খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার— এই সব কাজে যুক্ত, ভোটের সময় তাদের বেশিরভাগই শাসকদলের আশ্রয়ে। শাসকদল এদের নিয়ে সন্ত্রাস কায়েম করে জনমতকে জোর করে নিজেদের বাক্সে ভরায়। শাসকদলের কাছে এরা অপরিহার্য বলে, এরা খুন ধর্ষণে অভিযুক্ত হলে পুলিশ সহজে গ্রেপ্তার করে না। গণআন্দোলনের চাপে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলেও অপরাধ অনুযায়ী ধারায় মামলা করে না, যাতে সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সরকারের এই ভূমিকা, সেই সরকারের কাছে মানুষ কী আশা করতে পারে?

কংগ্রেসের বদলে সিপিএম, সিপিএমের বদলে তৃণমূল, তৃণমূলের বদলে বিজেপি, আবার বিজেপির বিরুদ্ধে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা— এই গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরোতে না পারলে নারী, পুরুষ কারওরই কোনও মুক্তি নেই। পুঁজিবাদী মিডিয়া, বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলি মানুষের ভাবনাকে বারবারই এই বৃত্তের মধ্যে আটকে দিচ্ছে। তাতে কোনও একটা দলের জয়পরাজয় নির্ধারিত হতে পারে— কিন্তু জনজীবনের সংকটের কোনও সমাধান নেই।

পঞ্চায়েত, পৌরসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে কি সত্যিই নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে? আসলে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তাঁদের স্বাধীন, নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ার কি কোনও সুযোগ আছে? ফলে এই পচা-গলা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, ভোটবাজ দলগুলির ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাঠকের মতামত

এ কোন বামপন্থার চর্চা!

পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান। অথচ সরকারে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকেই সিপিএম যা করতে শুরু করল, প্রথম প্রথম খুব দুঃখ হত সেসব দেখে। তারপর হত রাগ। এর পরে কী আসে— হতাশা? না, আমি হতাশ নই। বামপন্থার প্রতি আস্থা আজও আমার আছে। সে জন্যই চিঠিটা লিখছি এবং আপনাদের পাঠাচ্ছি।

১৯৭৭ সাল থেকে টানা প্রায় তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দলীয় কব্জা কায়েম করেই বিরাট কেউকেটা হয়েছিলেন সিপিএম নেতারা। ২০০৬-'০৭ সালে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষই প্রথম তাদের চ্যালেঞ্জ জানাল। প্রধানত সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট, ২০০৯ সালের লোকসভা ভোট এবং ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে সিপিএমের ক্ষমতার গড় ভেঙে পড়ল। সেই থেকেই কার্যত পায়ের তলায় আর কোনও মাটি নেই তাঁদের। গোড়ালি, হাঁটু, কোমরের হাড় এবং মেরুদণ্ডের ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ নৈতিক শক্তি ও মনোবল এমন ভাবে গুঁড়িয়ে গিয়েছে নেতাদের যে, এখন সামান্য উঠে দাঁড়াতে গেলেও দু-হাত জোড় করে কংগ্রেসের ক্রাচ ভিক্ষে করতে হচ্ছে। নেতৃত্বের এ হেন হাল দেখে কে বলবে, এ সেই প্রবল প্রতাপান্বিত সিপিএম, যার দুর্দান্ত দাপটে এক সময় সিঁটিয়ে থাকত রাজ্যের সাধারণ মানুষ!

গত সাত-আট বছর ধরে ক্ষমতায় ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে কী না করছে তাদের নেতারা! পঞ্চায়েত ভোটেও বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির সাথে যোগসাজশে আসন বাড়াবার কৌশল করেছিল তারা। পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে গিয়ে কর্মীদের বুঝিয়েছিল, তৃণমূল আমাদের সরকার কেড়ে নিয়েছে, ফলে ওরাই আমাদের প্রধান শত্রু। ওদের হঠাতে যা করতে হয় কর। নীতি-নৈতিকতাহীন ক্ষমতা দখলের নোংরা রাজনীতির পচা পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সিপিএম নেতৃত্ব আজ পড়েছে মহা ফাঁপরে। কারণ, তল্লাটে নিচু তলার কর্মী-সমর্থকদের মৌরসিপাট্টা কেড়ে নিয়েছে তৃণমূল। দাদাগিরি, তোলাবাজি, প্রোমোটারির ময়দানে এখন কেবলই জোড়াফুল। এই 'বঞ্চনা' সইতে না পেরে সিপিএম কর্মী-সমর্থকেরা, এমনকী নেতারাও, দলে দলে যোগ দিয়েছে দিদির 'উন্নয়নের যজ্ঞে'। যারা সে সুযোগ পাচ্ছে না, তারা ঢুকছে বিজেপিতে।

সুবিধাবাদের হিসেবনিকেশ যখন প্রায় শেষ, লোকসভার ভোট যখন শিয়রে তখন সিপিএম নেতাদের যেন টনক নড়েছে। তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, রাজ্যে তাদের শূন্য করে দেওয়ার জন্য অন্য কোনও শত্রুর দরকার নেই, নিজেদের কর্মী-সমর্থকরাই যথেষ্ট। মূলত তারাই বাড়িয়ে চলেছে গেরুয়া দুর্বৃত্তদের শিবির। এলাকায় এলাকায় চোখে পড়ছে সিপিএম পার্টি অফিসের পাশের দেওয়ালে বিজেপি প্রার্থীর পোস্টার। কিসে কী হচ্ছে ধরতে পেরে বিমান বসু-সূর্যকান্তরা মিটিংয়ে হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেছেন। কর্মীরা তলায় তলায় বলছেন, 'ছাড় ওসব। তৃণমূলকে টাইট দিতে গেলে বিজেপিকেই ভোটটা দিতে হবে।' কোনও কেন্দ্রিকতা ছাড়া পাহাড় থেকে সাগর সর্বত্র এই মানসিকতা এল কোত্থেকে? এ হেন মনোভাবের স্পষ্ট বার্তা পেয়ে রাজ্যে তৃণমূলকে টেক্কা দিতে নোটের বাণ্ডিল, মদ, মস্তান-বাহিনী আর রক্তাক্ত দাঁত-নখ এবং লকলকে জিভ নিয়ে ঘোঁৎ-ঘোৎ করতে শুরু করেছে জাত-ধর্ম ভাঙিয়ে খাওয়া বিজেপি। এক শ্রেণির ভাড়াটে সাংবাদিক টিভি-রেডিও-কাগজ ইত্যাদিতে দিনরাত বুঝিয়ে চলেছে রাজ্যে বিজেপিই এখন 'দু-নম্বর' দল। ফলে, সিপিএমের অস্তিত্ব জনসমক্ষে ফর্দাফাঁই এবং নেতারা কার্যত দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য।

ফলে, সিপিএম যে শুধু শূন্য হবে তা-ই নয়, বরং মাইনাসে রান করবে বলেই নানা জায়গায় কানাঘুষো চলছে। পরিচিত অনেকেই বলছেন, তিন-তিনটে দশক ধরে ভোট-রাজনীতিকে সম্বল করে নৈতিকতার যে কবর সিপিএম নেতারা খুঁড়েছেন, পরিস্থিতি যেন সেই কবরের দিকেই তাঁদের ঠেলছে।

তবু বামপন্থী হিসাবে আমি হতাশ নই। কারণ, আপনাদের দল রাজ্যের বিয়াল্লিশটা আসনেই লড়ছে বরাবরের মতো নীতি-আদর্শকে ভিত্তি করে। কাকে ভোট দেব, এ কথা আর ভাবতে হবে না।

পলাশ মিত্র, কলকাতা-৭৭

আলোর রোশনাইয়ের নিচে অন্ধকার

একের পাতার পর

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। স্বাভাবিক ভাবেই রোড শো কিংবা সভা ভরাতে লোকের অভাব ঘটছে না। সংবাদমাধ্যমের খবর, বারাণসীতে শুধু গোলাপের পাপড়িই কেনা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকার। অর্থাৎ দেশের মানুষ যেন প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিকে 'ভক্তের চশমা' দিয়ে দেখেন। কিন্তু গত পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রী সাংসদ হিসেবে কী করেছেন বারাণসীর সাধারণ মানুষের জন্য সেই হিসেবটা এই ভিড়ের মাঝে প্রায় হারিয়েই যাচ্ছে।

বারাণসী থেকে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। জেতার আগে দেদার প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি যে কোনও কসুর করেননি, এ তো না বললেও সবাই জানেন। কিন্তু কী অবস্থা সেই প্রতিশ্রুতিগুলির? প্রচারের আলো থেকে একটু দূরে গেলেই সেখানকার সাধারণ মানুষ কিন্তু এই প্রশ্নই তুলছেন।

বারাণসীর জন্য গত পাঁচ বছরে সরকার টাকা কম বরাদ্দ করেনি। কিন্তু তা খরচ হয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র হিসাবে শহরটাকে ঝাঁ-চকচকে করে তুলতে। সরকারি তথ্য বলছে, শহরের পরিকাঠামো বদলাতে ২০১৪-১৫ সাল থেকে ২১,৮৬২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কীসে খরচ হয়েছে এই বিপুল পরিমাণ টাকা? এয়ারপোর্টের আধুনিকীকরণ হয়েছে। বানানো হয়েছে চার লেনের হাইওয়ে। শহরে ঢুকতে বানানো হয়েছে বিশাল বিশাল ওভারব্রিজ। ১৭ কিলোমিটার রিং রোড। টাটার সাথে যৌথ ভাবে গড়ে ওঠা ক্যান্সার সেন্টারে সরকারি টাকা ঢালা হয়েছে। দীনদয়ালের নামে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী এবং বিক্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও ক্রেতার সংখ্যা সেখানে খুবই কম বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। পাশেই ২৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তাঁত এবং বস্ত্রশিল্পের তিন তলা বিশাল মিউজিয়াম তৈরি হলেও ক্রেতা তেমন একটা থাকে না। দোকানদার গুলজার আনসারি জানিয়েছেন, এখানকার বিখ্যাত কাড়োয়া শাড়ি মাসে ৩-৪টের বেশি বিক্রি হয় না। বারাণসীর মাণ্ডুয়াধি রেলস্টেশনটি একেবারে বিমানবন্দরের ধাঁচে ঝাঁ চকচকে করে তোলা হয়েছে। কিন্তু ভেতরের ক্যান্টিনের অবস্থা আগের মতোই।

শহরের গঙ্গার ঘাটগুলি আলোয় আলোয় ভরে দেওয়া হয়েছে। ফলে দশাশ্বমেধ থেকে অসসি পর্যন্ত দেদার নৌকাবিহার করছেন পর্যটকরা। আর এই 'উন্নয়ন' দেখাতেই প্রধানমন্ত্রী এমনকী জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল মাক্রঁকে এনে হাজির করেছিলেন। কিন্তু গঙ্গার ঘাটগুলি আলোয় ঝলমল করলেও 'স্বচ্ছ গঙ্গার' কী হয়েছে? এ কথা কারও অজানা নয়, 'নমামি গঙ্গা' প্রকল্পের হাজার হাজার কোটি টাকা গঙ্গার জলেই গেছে। বিজেপি নেতারা আর কন্ট্রাক্টররা মিলে সেই টাকা সাফ করে দিলেও গঙ্গা সাফ করা বা দু' পারের সংস্কারের কাজ প্রায় কিছুই হয়নি। ১৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সুসংহত ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার গড়ে তোলা হলেও শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা একই রকমের বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই থেকে গেছে। শহর জুড়ে চলছে অজস্র খোঁড়াখুড়ি। এখানেই নির্মীয়মান ফ্লাইওভারের অংশ ভেঙে পড়ে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল গত মে মাসে। নিকাশি সমস্যা একইরকম থেকে গেছে। যদিও ব্যবস্থার উন্নতির নামে কয়েকশো কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে।

কেমন আছেন বারাণসীর সাধারণ মানুষ? গঙ্গার ঘাটের মতো তাঁদের জীবনও স্বাচ্ছন্দ্যে উজ্জ্বল হয়েছে কি? তাঁদের কর্মসংস্থানের কী ব্যবস্থা করেছে মোদি সরকার? শিল্পের কী দশা বিখ্যাত এই শহরের? বারাণসীর ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আর কে চৌধুরী বলেছেন, শহরের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলেও শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় শূন্য। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেননি। কর্মহীন মানুষের সমস্যা গুরুতর আকার নিয়েছে। শহরের আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে তাকে 'বিশ্ব মানে' পৌঁছে দিতে বিপুল সংখ্যক গরিব, সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ করেছে সরকার। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আশপাশের সরু গলিগুলিকে মণিকর্নিকা, ললিতা এবং জলসেন ঘাট পর্যন্ত ৫০ থেকে ৭০ মিটার পর্যন্ত চওড়া করা হয়েছে। উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলিকে শহর ছাড়তে হয়েছে। সরকারের তরফে তাঁদের হাতে যা দেওয়া হয়েছে, কাজের জন্য সেই শহরেই প্রতিদিন যাতায়াত করতে করতে তার কতটুকু কতদিন হাতে থাকবে সেই চিন্তা অনেককেই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এঁদের কেউ গঙ্গার ঘাটে নৌকা চালান, কেউ পরিচারিকার কাজ করেন, কেউ অন্য পেশায় যুক্ত। এখন তাঁদের হয় অন্যত্র কাজ খুঁজতে হচ্ছে, না হয় অনেক টাকা খরচ করে প্রতিদিন শহরে আসতে হচ্ছে। বেনারস আইআইটির অধ্যাপক, সঙ্কটমোচন মন্দিরের মহন্ত বিশ্বম্ভর নাথ মিশ্র বলেছেন, যেভাবে শহর জুড়ে ভাঙচুর চলছে, তাতে ভ্রান্ত চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। এর দ্বারা শহরের মূল চরিত্রকেই বদলে দেওয়া হচ্ছে। যাদের এখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তারাই এখানকার আদি বাসিন্দা। বেনারস শিবের শহর বলে পরিচিত। অথচ একে বিশেষ একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে তোলা হচ্ছে।

একসময় বেনারসে প্রায় ৫ লক্ষ তাঁত শিল্পীর বাস ছিল। এখন

> **কেমন আছেন বারাণসীর সাধারণ মানুষ? গঙ্গার ঘাটের মতো তাঁদের জীবনও স্বাচ্ছন্দ্যে উজ্জ্বল হয়েছে কি? তাঁদের কর্মসংস্থানের কী ব্যবস্থা করেছে মোদি সরকার? শিল্পের কী দশা বিখ্যাত এই শহরের? বারাণসীর ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আর কে চৌধুরী বলেছেন, শহরের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলেও শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় শূন্য। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেননি।**

তা অনেকখানি কমে গেছে। বিশ্বায়নের ধাক্কা এসে লেগেছে এই শিল্পে। বহু মানুষ পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। বেশিরভাগ তাঁতশিল্পী দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা চান সরকার তাঁদের পরিচয়পত্র দিক এবং তার ভিত্তিতে তাঁদের সহায়তা দিক। একসময়কার তাঁত শিল্পীদের কলোনিগুলো, যেমন মদনপুরা, এখন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। ক্ষমতাশালী এবং ধনীরা টাকার জোরে তাঁদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছে।

জিএসটি তাঁত শিল্পেও মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। উৎপাদন কমেছে, বিক্রিও কমেছে। জিএসটি ব্যবসার ধরনটাই বদলে দিয়েছে। মহম্মদ আসিফ, যাঁর অধীনে দৈনিক ১২ জন লোক কাজ করে তিনি বলেছেন, আগে যা চলত অনেকখানি মুখের কথায়, বিশ্বাসের উপর, এখন সেখানে চালু হয়েছে 'রিসিট বই' পদ্ধতি। যা ব্যবসার বিরাট ক্ষতি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায়, সাফল্যের তালিকায় সাধারণ মানুষের জীবনের এই সব সমস্যাগুলি নেই। বরং হাইওয়ে, ওভারব্রিজ, চওড়া রাস্তা আর চীনা আলোর ঝলকানিতে জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে ঢেকে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি ও তাঁর দলের নেতারা। তাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় এবার 'আচ্ছে দিন', 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ', 'কালো টাকা উদ্ধার', মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি কথাগুলি, এমনকী 'নোট বাতিলের' কথাও একেবারে উধাও। পরিবর্তে এসেছে, বালাকোট, পাকিস্তান, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি কথাগুলি। স্বাভাবিক ভাবেই মহম্মদ আসিফের উদ্বেগও বেড়েছে। তিনি বলেন, পুলওয়ামা ঘটনার পর হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। তারা যখন তখন শোনাচ্ছে, 'পাকিস্তানে কবে যাবে?' আর এক ব্যবসায়ী পারভেজ আখতার বলেন, মোদি ক্ষমতায় আসার পর হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে একটা বিভাজনের রেখা সবারই চোখে পড়ছে। যদিও তাঁর আশা, বারাণসীর ঐতিহ্য বদলাবে না। কারণ দূর অতীত থেকেই এখানকার দুই সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন এবং জীবিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। কিন্তু এই ঐতিহ্যের মূল্য বোঝেন কি 'ঐতিহ্যবাদী' বিজেপি দলের নেতারা বা প্রধানমন্ত্রী নিজে? তাঁদের তো একটিই লক্ষ্য— ক্ষমতায় বসে পুঁজিপতি শ্রেণির লুটপাটের ব্যবস্থা করা এবং তার উচ্ছিষ্ট পাওয়া। তার জন্য সাধারণ মানুষকে বলি দিতে তাঁরা পিছপা নন।

তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া (আপডেটস) ২৬ এপ্রিল ২০১৯

রক্তাক্ত গুজরাটের স্মৃতি ফিরে এল

একের পাতার পর

ঘটনার পরদিন রান্নাঘরে কাজ করছিলেন বিলকিস, এমন সময় তাঁর এক আত্মীয়া ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেন যে তাঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিলকিস বানো, তাঁর পরিজন ও পড়শিরা এক-কাপড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, এমনকী চটিটা পায়ে গলানোর সময়টুকুও ছিল না তাঁদের। এর পর দিনকয়েক নিজের ১৭ জন আত্মীয়ের সাথে আশ্রয়ের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন বিলকিস। সঙ্গে তিন বছরের মেয়ে, মা, এক অন্তঃসত্ত্বা বোন, অন্য ভাইবোনেরা সহ আরও কয়েকজন। ৩ মার্চ সকালে অন্য এক গ্রামে যাবেন বলে যখন তাঁরা বেরিয়েছিলেন, দুটো জিপে বেশ কয়েকজন হামলাকারী তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সবাই বিলকিসের দীর্ঘদিনের পরিচিত এক মহল্লার বাসিন্দা। তারা খুন করে ১৪ জনকে। অসহায় বিলকিসের চোখের সামনে তাঁর তিন বছরের মেয়েকে পাথরে আছাড় মারে। মাথা থেঁতলে মারা যায় শিশুটি। তিনি অন্তঃসত্ত্বা এ কথা বলে হাতে পায়ে ধরে রেহাই চাওয়ার পরেও নরপশুরা বার বার ধর্ষণ করে বিলকিসকে, তাঁর জামাকাপড় খুলে নেয়। চেতনা হারান বিলকিস। মৃত মনে করে তাঁকে ফেলে চলে যায় হামলাকারীরা।

জ্ঞান ফেরার পর রক্তমাখা কাপড়ের টুকরোয় নগ্ন শরীর কোনক্রমে ঢেকে কাছের এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন বিলকিস। পরদিন তেষ্টায় কাতর হয়ে নিচে আদিবাসীদের একটি গ্রামে গিয়ে সাহায্য চান। আদিবাসীরাই তাঁকে আশ্রয়, খাবার দাবার ও জামাকাপড় দেন। এরপর বিলকিস নামেন এক ভয়ানক অসম যুদ্ধে।

পরদিন কাছের থানায় গিয়ে অত্যাচারের বিবরণ দেন বিলকিস। পড়াশোনা জানা না থাকায় তাঁর বক্তব্য লিখে নেয় পুলিশ, এফ আই আর-এ নিয়ে নেয় তাঁর আঙুলের ছাপ। পুলিশের কাছে আক্রমণকারীদের নাম বলেছিলেন বিলকিস। কিন্তু পুলিশ সেগুলি লেখেনি। তাই বয়ানটি পড়ে শোনানোর অনুরোধ করলে পুলিশ তা অস্বীকার করেছিল। এর পর বিলকিসের স্থান হয় গোধরার একটি উদ্বাস্তু শিবিরে। সেখানে স্বামী ইয়াকুব রসুলের দেখা পান তিনি। এত কিছুর পরেও বেঁচে ছিল তাঁর গর্ভের সন্তান, যথাসময়ে জন্ম হয় তার।

পুলিশে অভিযোগ জানানোর এক বছর পর ২০০৩ সালে গুজরাটের লিমখেডার স্থানীয় আদালত বিলকিসের মামলাটিকে বন্ধ করে দেয়। পুলিশ এমন ভাবে মামলা সাজিয়েছিল যে পুরো জিনিসটাই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিলকিস ও তাঁর স্বামীকে পুলিশ আর কিছু সরকারি কর্মচারীর ভয় দেখানো আর খুনের হুমকি। হামলার প্রমাণ লোপাট করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ময়না তদন্ত না করেই মৃতদেহগুলি কবর দেওয়া হয়েছিল। দু'জন ডাক্তারকে দিয়ে পুলিশ লিখিয়ে নিয়েছিল যে বিলকিসকে ধর্ষণ করা হয়নি।

এ সব ঘটনা যে বিচ্ছিন্ন নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পরে প্রত্যক্ষদর্শী ও সাংবাদিকদের অসংখ্য রিপোর্টে, বহু তদন্তে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ২০০২-এর সেই সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞের পরিচালক ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রশাসন যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের নির্দেশে চলেছিল হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের বাঁচানোর প্রশাসনিক অপচেষ্টা। বাস্তবে এটি যে ছিল একটি সংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। রিপোর্ট থেকে এ কথা আজ সকলেরই জানা যে, গোধরা ঘটনার পরদিন সকাল থেকেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শহর ও গ্রামগুলিতে সশস্ত্র হামলা শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রমণকারীরা ছিল বহিরাগত। ভোটার তালিকা হাতে দলবদ্ধভাবে এসে বেছে বেছে তারা মুসলমান নাগরিকদের বাড়ি, দোকান, গরিব মুটে-মজুরদের বস্তি, শ্রমিক মহল্লা, পাড়া এমনকী ধর্মস্থানে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছে। উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাবাজরা এভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে এর পিছনে শুধু পূর্ব পরিকল্পনা ছিল তাই নয়, তাকে বাস্তবে কার্যকর করেছে নেতৃত্ব ও তার নির্দেশ।

এই নেতৃত্ব যে বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের কাছ থেকে এসেছিল, তাও অসংখ্য রিপোর্টে স্পষ্ট। গণহত্যা শুরু হওয়ার পর তৎকালীন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুধু যে তা সমর্থন করেছেন তাই নয়, তাঁর সরকারের মন্ত্রীরা পুলিশ কন্ট্রোলরুমে বসে থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য করেছেন। যে পুলিশ অফিসাররা এই বর্বর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন বা তাণ্ডবকারীদের পাকড়াও করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁদের বদলি করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুললে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সব ঠিক চলছে। যা দেখছেন শুনছেন, এসবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এটা দাঙ্গা নয়, গণবিক্ষোভ' (গণদাবী, ৫৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা)। বাস্তবিকই ওই ঘটনা দাঙ্গা ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের মদতে উন্মত্ত উগ্র হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজদের সংখ্যালঘু হত্যা। মৃত্যু হয়েছিল হাজারেরও বেশি মানুষের। ৬০ হাজারের বেশি মানুষকে ঘরবাড়ি হারিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল উদ্বাস্তু শিবিরে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল।

আবার ফিরে আসা যাক বিলকিস বানোর অসম যুদ্ধের কাহিনিতে। ২০০৩ সালে স্থানীয় আদালত তাঁর মামলা 'ক্লোজ' করে দিলে বিলকিস জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হন এবং সেই সূত্রে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে যায়। বিলকিসকে চাপে ফেলতে শুরু হয়ে যায় তাঁর পরিবারের ওপর গুজরাট পুলিশের হয়রানি ও হুমকি। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে শীর্ষ আদালত গুজরাটের বিজেপি সরকার ও পুলিশের ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে সিবিআই-কে নির্দেশ দেয় মামলাটি নিয়ে তদন্ত করতে। ২০০৪-এর মে মাসে সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়, যে রিপোর্টে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুজরাট সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। সিবিআই-এর পরামর্শ মেনে সুপ্রিম কোর্ট বিলকিস বানোর মামলার বিচার গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে সরিয়ে আনে। ২০০৮-এর জানুয়ারিতে আদালত ১৩ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করলেও অভিযুক্ত দুই ডাক্তার ও পাঁচ পুলিশ অফিসারকে নির্দোষ ঘোষণা করে। পরে বম্বে হাইকোর্ট সেই রায় পরিবর্তন করে ২০১৭ সালে ১১ জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় এবং ডাক্তার ও পুলিশ অফিসারদেরও দোষী বলে ঘোষণা করে। বিলকিস বানোকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয় কোর্ট। এর বিরুদ্ধে আবার সুপ্রিম কোর্টে আপীল করেন বিলকিস যার ভিত্তিতে গত ২৪ এপ্রিল আদালত গুজরাট সরকারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য সুবিধা তাঁকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

গুজরাট নিধনযজ্ঞ (ফাইল চিত্র)

এই দীর্ঘ ও কঠিন লড়াইয়ে বিলকিসকে সব রকমে সাহায্য করেছেন যে আইনজীবী, তিনি মন্তব্য করেছেন, শুধু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে নয়, এই লড়াই ছিল খোদ সরকার আর প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। তিনি বলেছেন, গত ১৭ বছর ধরে আক্রান্তের পাশে দাঁড়ানো দূরের কথা, গুজরাট সরকার সমানে চেষ্টা করে গেছে দুষ্কৃতীদের আড়াল করার। পুলিশ বিলকিসের অভিযোগকে প্রথম দিকে আমলই দিতে চায়নি, বার বার চেষ্টা করেছে যাতে এফআইআর-এর বয়ান বদল করা যায়। এমনকী ঘটনাস্থল বদলে ফেলারও চক্রান্ত চালিয়ে গিয়েছে গুজরাট পুলিশ। সরকারি উকিল ক্রমাগত তারিখ নেওয়ার কৌশল চালিয়ে গেছেন। এর সঙ্গে ছিল বিলকিস ও তাঁর স্বামী-সন্তানদের খুনের হুমকি দেওয়া। প্রাণ বাঁচাতে বহু বার ঠিকানা পাল্টাতে হয়েছে তাঁদের। গত ১৭ বছর ধরে এমনকী নিজের ভোট পর্যন্ত দিতে পারেননি বিলকিস ও তাঁর স্বামী।

বিলকিস বানোর এই সাহসী লড়াই হাসি ফুটিয়েছে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মুখে। মুসলিম নারীদের অধিকার রক্ষার কথা বলে সভায় সভায় চোখের জল ফেলেন যে নরেন্দ্র মোদি, তাঁর ভণ্ডামির দিকে ধিক্কারের আঙুল তুলেছেন তাঁরা। ভোটে যাওয়ার আগে মায়ের পায়ে প্রণামরত মোদিজির ছবি ছাপা হয় কাগজে কাগজে। অথচ বিলকিসের মতো মায়েদের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে মাথা থেঁতলে মেরেছে যারা, তাদের মাথায় অভয় হস্ত রাখতে তাঁর অসুবিধা হয় না! বিলকিস বানোর কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইবেন না কেন নরেন্দ্র মোদি?

শুধুমাত্র অন্য ধর্মের অনুগামী হওয়ার 'অপরাধে' একদল নিরীহ মানুষের দিকে আরেক দলকে খেপিয়ে তুলে লেলিয়ে দেওয়াই মোদির দল বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের 'ধর্ম'। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করাই তাদের কৌশল।

গত পাঁচ বছরের বিজেপি শাসনে এর অসংখ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছে এ দেশের মানুষ। বিলকিস বানোর ঘটনা এই অপশক্তিকে চিনে নেওয়ার আরও একটা সুযোগ এনে দিল। দেখিয়ে দিয়ে গেল, সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে গেলে লড়াই ছাড়া পথ নেই। এক বিলকিস বানোর লড়াই অনুপ্রেরণা দিয়ে গেল ২০০২-এর গুজরাট তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত, বহু কিছু হারিয়ে ফেলা অসহায় হাজারো সুবিচারপ্রার্থীদের।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দলের হালতু কায়স্থপাড়া অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী কমরেড অরুণ সরকার ১২ এপ্রিল নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ১৯৬৪-'৬৫ সালে যে কয়েকজন তরুণ কর্মী হালতু-কসবা অঞ্চলে দলের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন প্রয়াত কমরেড অরুণ সরকার তাঁদের সামনের সারিতে ছিলেন। এলাকায় ছাত্র এবং যুব আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে দলের শক্তিবৃদ্ধিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সমাজকর্মী, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে তাঁর সবিশেষ পরিচিতি ছিল। তিনি দীর্ঘ সময় হালতু তরুণ সংঘ ও হালতু সাধারণ পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এস ইউ সি আই (সি) কসবা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সংঘের পার্শ্ববর্তী একটি নির্মীয়মান বাড়িতে ২১ এপ্রিল স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন তাঁর শৈশবের বন্ধু দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন পালিত, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কমরেড অরুণ সরকার লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার ইটখোলা অঞ্চলের গোলাবাড়ির কমরেড কালিপদ সরদার বয়সজনিত রোগে নিজ গৃহে ২৮ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ষাটের দশকের শেষের দিকে ভাগচাষি আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা প্রয়াত কমরেড আমিনুদ্দিন আখন্দের নেতৃত্বে তিনি দলের কৃষক খেতমজুর সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। কমরেড কালিপদ সরদার কংগ্রেস ও সিপিএমের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বহু মিথ্যা কেসে হাজতবাস করেন। কিন্তু কিছুই তাঁর দলের প্রতি ভালবাসায় আঘাত করতে পারেনি।

কমরেড কালিপদ সরদার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম’

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলেন নদীয়ার চাকদা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। দলের নাম শুনেই ‘আসুন আসুন’ বলে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন এক মহিলা। পরিচয় করালেন প্রবীণ এক মানুষের সঙ্গে— ওঁর বাবা। সাগ্রহে তিনি বললেন, আপনাদের জন্যই তো কতদিন ধরে অপেক্ষা করছি! আমি দীর্ঘদিন সিপিএম করেছি। দল যে এভাবে বিজেপিকে ভোট করাবে এ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ভুল নেতৃত্বের জন্যই দলের আজ এই পরিণতি। আপনাদের অনেক দিন ধরেই দেখছি। আপনারাই পারবেন বামপন্থাকে সঠিক দিশা দিতে। কমরেড প্রভাস ঘোষের ‘জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে’ বইটি নিলেন, চাঁদা দিলেন এবং আবার আসার জন্য বারবার অনুরোধ করলেন। ওই এলাকায় সিপিএম-বিজেপির এক হওয়ার কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। যাঁরা মনেপ্রাণে বামপন্থী তাঁরা নেতৃত্বের এই অবাম আত্মঘাতী নীতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

তেমনই একজন প্রাক্তন শিক্ষক কর্মীদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনারা কি জানেন কত মানুষ আপনাদের ভালবাসে? কত মানুষ আপনাদের পিছনে আছে? বললেন, সারা জীবন বামপন্থী রাজনীতি করে এসে এক চরম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমর্থন করার কথা ভাবতেও পারছি না। চাঁদা দিয়ে বললেন, আমার মতো অনেকেই আছেন, তাঁদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমি যতজনকে পারব বলব। দলের কর্মীরা যখন ওই এলাকায় প্রার্থীর চিহ্ন টর্চের ছবি দেওয়া পোস্টার মারছেন, তখন তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ। বললেন, আপনারা এবার কী চিহ্ন পান সেটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

‘বামপন্থী তো আপনারাই’

আসামের বরপেটা কেন্দ্র। সিপিএম সেখানে প্রার্থী দেয়নি। সেখানে তাদের দলের নেতারা একাধিক জনসভা করে বলেছেন, এই কেন্দ্রে কোনও বামপন্থী প্রার্থী নেই, তাই সব ভোট কংগ্রেসকে দিতে হবে। এমনই একটি জনসভার কিছুক্ষণ বাদেই সেখানে পৌঁছে গেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী হুসনেজাহা বেগমের (ইনা হুসেন) প্রচার মিছিল। এলাকার সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা অবাক— নেতারা তাহলে ডাহা একটি মিথ্যা বলে গেলেন? পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন তাঁদের অনেকেই। আপনারা ভোটে আছেন, তাও বলল এখানে কোনও বামপন্থী প্রার্থী নেই। বলে গেল কংগ্রেসকে ভোট দিতে! এই নির্দেশ মানা যায় না। আমরা আপনাদেরই ভোট দেব। বামপন্থী তো আপনারাই। ভোটের পরেও বেশ কিছু সিপিএম সমর্থক স্থানীয় এসইউসিআই (সি) কর্মীদের বলে গেছেন, ভোটটা আপনাদেরই দিয়েছি। এবারে নেতাদের ধরব, কেন মিথ্যা বলল তার জবাব চাইব।

শিলচরে সিপিএম জেলা সম্পাদক নিজে একাধিক জনসভা করে প্রচার করেছেন, এসইউসিআই (সি)-কে নয়, ভোট দিন কংগ্রেসকে। ধিক্কারে ফেটে পড়েছেন বহু সিপিএম সমর্থক সৎ মানুষ। প্রকাশ্যে বলে গেছেন তাঁরা, ‘কোনও দিন ভাবিনি যে, নিজেরা প্রার্থী না দিয়ে সিপিএম এভাবে কংগ্রেসের প্রচারকে পরিণত হবে!’ তাই শিলচর কেন্দ্র জুড়ে সিপিএম সমর্থকদের মুখে মুখে ছড়িয়েছে, ‘কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারব না, বামপন্থার মর্যাদা রাখল এসইউসিআই, ভোটটা ওরাই পাবে’।

‘ভেবেছিলাম বিজেপিকে ভোট দেব, বইটা পড়ে সম্বিত ফিরল’

দলের এক কর্মীর কাছে হঠাৎ তাঁর ছাত্রীর ফোন। ‘স্যার খুব ব্যস্ত? মা আপনার সাথে কথা বলবেন।’

‘স্যার বইটা পড়েছি। নতুন অনেক কিছু জানলাম। খুব ভাল লাগল। আপনাদের পার্টির এত ভাল ভাল কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। অন্য দলগুলির উপর বিরক্ত হয়ে এবার ভেবেছিলাম বিজেপিকে ভোট দেব। কিন্তু আর তো বিজেপিকে ভোট দিতে পারব না।’ কর্মীটি প্রশ্ন করলেন, ‘কেন দিদি?’ তিনি বললেন, ‘বইটা পড়ে বিজেপির রাজনীতিটাও ধরতে পারলাম। আপনাদের দলের চিহ্ন কী জানাবেন।’ রাতেই ফোন করে চিহ্নটা জানিয়ে দিলেন তিনি। ছাত্রীর বাড়ি রানাঘাট লোকসভায়। কলকাতায় আসে পড়তে। ছাত্রীকে বইটি দিয়ে কর্মীটি বলেছিলেন, ‘তুমি পড়ে মাকেও পড়তে দেবে। পড়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলবে।’ বই পড়ার পর তিনি গণআন্দোলনের পক্ষে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘ভোটের পরে আসুন, আলোচনায় বসব’

ভোটে প্রচারের সময় হাওড়ার একটি জায়গায় দশ-বারো জন যুবকের একটি গ্রুপ দলের এক সংগঠককে বললেন, ‘আমরা দীর্ঘ দিনের বামপন্থী। কিন্তু দল যা করছে তা কিছুতেই মানতে পারছি না। এবার ভোটে কোনও কাজ করিনি। দলের এমন দুরবস্থা, কেন কাজ করছি না সেটাও কেউ খোঁজ নিতে আসেনি। আপনাদের লড়াই আন্দোলন আমরা সমর্থন করি। প্রভাসবাবুর বইটি পড়েছি। ভালো লেগেছে। ভোটের পরে আসুন আলোচনায় বসব। আমরা এখানে কাজ করতে চাই।’

আইনজীবীদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদ

আইনজীবীদের সংগঠন লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার ২৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছে, ২৪ এপ্রিল হাওড়া কোর্টের আইনজীবী ও হাওড়া কর্পোরেশনের কর্মীদের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে পুলিশের উচ্চস্তরের আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ যে নজিরবিহীনভাবে বহু আইনজীবী, ল-ক্লার্ক ও সাধারণ মানুষের উপর লাঠিচার্জ করে তাতে সাধারণ মানুষ সহ আইনজগৎ স্তম্ভিত। মহিলা আইনজীবী সহ বহু আইনজীবী ও ল-ক্লার্ককে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। কোর্টে বিচারকরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কার নির্দেশে পুলিশ ও র‍্যাফ নির্মমভাবে লাঠি চালাল এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করল তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পরদিন লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের এক প্রতিনিধি দল হাওড়া কোর্টের আইনজীবীদের প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের সাথে থাকার অঙ্গীকার করেন। সংগঠনের সভাপতি ও সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত বলেন, ‘এই পুলিশি অত্যাচারের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে’। সংগঠনের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলী বলেন, আইনজীবীদের উপর পুলিশের এই ন্যক্কারজনক, নজিরবিহীন আক্রমণের দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। তিনি রাজ্যের সমস্ত স্তরের আইনজীবী এবং ল-ক্লার্কদের হাওড়া কোর্টের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী এক প্রতিবাদ মিছিল এবং রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার দাবি করেন।

সংগঠন দাবি করে, ঘটনার উপযুক্ত বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, হাওড়া কোর্ট সহ রাজ্যের সমস্ত কোর্টের সকল আইনজীবীদের বসার ব্যবস্থা, গাড়ি রাখার সুব্যবস্থা সহ কোর্টের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।

চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মিছিল চন্দননগরে

২১ এপ্রিল চন্দননগরে শতাধিক মানুষ যোগ দিলেন মিছিলে। সমস্ত চিটফান্ডের আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে ফেরত, দোষীদের শাস্তি ও এজেন্টদের আত্মহত্যা আটকানোর কোনও বাস্তবোচিত পথের সন্ধান কেউ করছেন না। আদালত টাকা ফেরতের রায় দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র

এজেন্টদের নিরাপত্তার দাবি তুললেন তাঁরা। মিছিল শেষে বৃষ্টির মধ্যেও এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা সম্পাদক অমিতা বাগ ও রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী।

তাঁরা বলেন, ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে বাধ্য করতে হবে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে। চিটফান্ডের মতো গুরুতর জীবনমরণ সমস্যাকে ২০১৪ সাল থেকে ইস্যু বানিয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো অসহায় আমানতকারীদের দাবার চালের মতোই ক্ষমতায় যাওয়ার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু মূল সমস্যা অর্থাৎ প্রতারিতদের টাকা ফেরত এবং ও রাজ্য কোনও সরকারই তা কার্যকর করছে না। বিভিন্ন চিটফান্ড কোম্পানির কৃতকর্মের দায় সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-মন্ত্রী-আমলারা চিটফান্ড থেকে যে বিপুল পরিমাণে টাকা কামিয়েছেন তা জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তদন্তের নামে দুই সরকারের মধে দড়ি টানাটানি দেখে বহু এজেন্ট-আমানতকারী আজ হতাশাগ্রস্ত। ইতিমধ্যে তিন শতাধিক আমানতকারী ও এজেন্ট আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। পরিস্থিতি খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নেতৃবৃন্দ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন, যা আমানতকারী ও এজেন্টদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com